Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 108–114
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি

আফরোজা ইয়াসমিন
ই-মেইল: afroja.yeasmin03@gmail.com

Keyword
সাময়িকপত্র, তত্ত্ববোধিনী, বিরাম চিহ্ন, সাধু গদ্য, সীতার বনবাস

Abstract

Discussion
কবিতা বা পদ্য আমাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে কল্পনার জগতে বিচরণ করতে শেখায়। অন্যদিকে গদ্য আমাদের দীক্ষিত করে পৌঁছে দেয় বাস্তবতার শিক্ষালোকে। তবে গদ্য বা পদ্যের ব্যবধান খুব বেশি নয়। উভয়ই পাঠকের মানসিক ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিগত বিচারে গদ্য ও পদ্য দুইয়ের উপাদান ভিন্ন। শব্দ, বাক্য হ্রস্ব বাক্য, বাক্যাংশ সমবায়ে গঠিত দীর্ঘ বাক্য ইত্যাদি নানা প্রকার উপাদান গদ্যে পরিলক্ষিত হয়। আবার গদ্য-পদ্যের গুণগত ব্যবধান লক্ষ করা যায়। আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে হাঁটা চলা কথাবার্তায় একপ্রকার স্টাইল পরিলক্ষিত হয়। যা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে একই ভাবে বাংলা গদ্যের উৎপত্তিকাল থেকে স্টাইল বিশেষে প্রত্যেক লেখকের গদ্যভাষা ভিন্ন প্রকারের হয়।

সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের যুগে বাংলা গদ্যের স্টাইল বা রচনারীতি প্রথম আবিষ্কার করেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের তুলনায় ঈশ্বর গুপ্তের অধিক মূল্য অবশ্য স্বীকার করতে হয়। তবে সমালোচনার নিরিখে ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের গদ্য প্রসঙ্গে বলেন –

> "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখার মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা আনায়াসেই হৃদয়াঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও মিষ্টতা ছিল না।"[১]

সাময়িক পত্রের গতানুগতিক ধারা ভঙ্গ করে ১২৫০ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৪৩ খ্রি.) প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকায় ধর্ম ব্যাখ্যান ছাড়া নীতিগর্ভ বিজ্ঞান বিষয়ক আধ্যাত্মতত্ত্ব ঘটিত শিক্ষা সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ন বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকদের রচনা গদ্যকে সাবলীন করে তুলতে সাহায্য করে। বাংলা গদ্যে নিজস্ব সরল স্টাইল নির্মাণ করেন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাঞ্জাবে ধরমশালা থেকে শ্রীকণ্ঠ সিংহকে লিখিত একটি চিঠির রচনাংশ উল্লেখ করলে তা স্পষ্ট হয় –

> "এই পর্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্যের কিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে যে, এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম।"[২]

অনুবাদ, তর্কাতর্কি, কিছু পাঠ্যপুস্তক, সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রে ছিল বাংলা গদ্য চলাচলের পথ। সেই পথকে রাজপথে পরিণত করেন একান্ত নিজস্ব গুণপনায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের অপভাষা অবলম্বন না করে নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনায় তা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে সাহিত্যের যোগ্যতম লালিত্যময় সুডৌল গদ্যরীতি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রসঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে ড. সুকুমার সেন জানান –

> "বাংলা গদ্যের জটিলতা গুছাইয়া বাক্যে অনেকখানি ভারসাম্যতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত...। এখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিমিতি ও লালিত্য সঞ্চার করাইয়া বাংলা গদ্যকে সজীব ও সতেজ করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় শ্বাসোচ্ছ্বাস তরঙ্গিত স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ অনুধাবন করিয়া বাক্যে শব্দানুবৃত্তির খাঁটি রূপ নির্দেশ করিয়া তিনি বাঙ্গলা গদ্যের তাল বাঁধিয়া দিলেন।"[৩]

সংস্কৃত সাহিত্যের সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যরীতির আদর্শ পরিহার করে বাংলা গদ্যের নবদিক উন্মোচন করেন। বাংলা নবজাগরণেরকালে একজন শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চরিত্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় ও ইওরোপীয় যাবতীয় গুণের প্রকাশ ঘটান তাঁর নানান কর্মকাণ্ডে এবং বাংলা গদ্যরীতিতে। ফলত ম্যাথু আর্নল্ড কথিত গদ্যের আদর্শ তাঁর লক্ষ হয়ে ওঠে –

> "the needful qualities for a fit prose are regularity, uniformity precision and balance."[8]

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সাহিত্য গদ্যে রূপ দান করেন। বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা তিনি আবিষ্কার করেন বাংলা গদ্যের একটি বাক্য কয়েকটি বাক্যাংশের সমষ্টিমাত্র এবং বাক্যাংশগুলি শ্বাসপর্ব (ব্রেথ-গ্রুপ) ও সার্থ পর্বে (সেন্স-গ্রুপ) বিভক্ত। বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই–

১. দীর্ঘ সমাসবহুল বাক্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে বিভক্ত করেন।
২. পদগুলির মধ্যে ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করেন।
৩. ছেদ চিহ্ন প্রয়োগ করে অর্থ সম্পন্ন বাক্যাংশ সৃষ্টি করেন।
৪. ক্রিয়ারুপে ও শব্দে সরলতা নিয়ে আসেন তিনি।
৫. অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থমন্ডল তাঁর সৃষ্টি।
৬. বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দ ও গতিবেগ আবিষ্কার করেন তিনি।
৭. প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও গদ্যের সাবলীনতা বজায় রাখার জন্য সুললিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন।
৮. অধীন বাক্যাংশের সংখ্যা হ্রাস করেন।
৯. বিরাম চিহ্নের উত্তরোত্তর বহুল ব্যবহার বিদ্যাসাগরের গদ্যে পরিলক্ষিত হয়।
১০.শ্বাস-পর্বানুসারে বাক্যাংশ ব্যবহার তাঁর গদ্যে পরিলক্ষিত হয়।
১১. সম্বোধন পদের পরিবর্তন, ক্রিয়ারূপের সরলতা ও পদান্বয়ের সংস্কার সাধনে তিনি দক্ষ কারিগরী শিল্পের পরিচয় দেন।
১২. অর্থানুসারে কমা, ড্যাশ, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার করেন তিনি।

বাংলা সাধু গদ্যের কাঠামো কি হওয়া উচিত এবং চলিত গদ্যের উপযোগী করে তুলতে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান তিনি। বেনামে প্রকাশিত 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) গ্রন্থগুলিতে প্রচুর দেশি-বিদেশি শব্দ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের গদ্যের স্টাইল প্রসঙ্গে জানান –

> "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অতিশয় পেলব ও মার্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রসনৈপুন্যের সঙ্গে আধুনিক ইওরোপীয় মনোবৃত্তিসুলভ যুক্তিনিষ্ঠা ও পরিমাণবোধ, স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা, এই দুইয়ের মিলন ঘটেছে বিদ্যাসাগরীয় স্টাইলে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে বলেন বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। তাঁর কথায়-

> "তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ...বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন।" [৬]

গ্রাম্য সাধু পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা ত্যাগ করে বাংলা সাধু গদ্যের মধ্যগা রীতির আবিষ্কারক তিনি। তাঁর গদ্যরীতির পরিচয় দিতে উদাহরণস্বরূপ 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) গ্রন্থের কিয়দংশ উল্লেখ করা হল–

> "কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া গৌতমি লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছো, কিছু উপশম হয়েছে?" [৭]

রাজপথে চলাচলের উপযোগী বিদ্যাসাগরের ভাষা কখনো হোঁচট খায় না। উল্লেখিত গদ্যাংশে সম্বোন্ধন ও প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তদ্ভব ও সরল ক্রিয়ারূপের প্রয়োগ এখানে রয়েছে।

> "যদি বলেন, নরক কেমন সুখের স্থান, সে বোধোদয় থাকিলে, তুমি কখনই নরকে যাইতে চাইতে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় এক ভদ্র সন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি একেবারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া, তাহার গুরুদেব উপদেশ দিয়া তাঁহাকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই, গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ রাজ রাজাড়া, সব নরকে যাইবেন;" [৮]

এই অংশের গদ্য চলিত ভাষার উপযোগী হয়ে ওঠে। অনভিজাত শব্দের অকুণ্ঠ প্রয়োগও এই অংশে পরিলক্ষিত হয়।

বিদ্যাসাগরের গদ্য সুষম সরল সাবলীল। ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ ও কল্পনার ছোঁয়াচে বিদ্যাসাগরের গদ্য কথ্য গদ্যের রূপাশ্রয়ী। সাধু গদ্যের সংস্কারমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য' ও 'গ্রাম্য বর্বরতা' বর্জিত সাধু গদ্যের মধ্যগা রীতির 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃ স্রোতে' সঞ্চারিত বিদ্যাসাগরের গদ্য। তবে বলা যায় বিদ্যাসাগরের হাত ধরেই পরবর্তী লেখকেরা গদ্য সাহিত্যের প্রাঙ্গণে সোজা পথ চলা শুরু করেন। তাই বলা যায় বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাংলা গদ্যের সূচনা হলেও বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী তিনি। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন তা নয়, তাকে সুশোভনভাবে গড়ে তুলতে তিনি সদাপ্রচেষ্ট-

> "বৎসে! কিছুদিন হইল আমি নানা কারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোন বিষয়েই, কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র

> সুখবোধ প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানিং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্বশরীর তৎক্ষণাৎ যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনীশক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমাসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবনের কার্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানিং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে।"[৯]

ইংরেজি ও তদ্ভব শব্দের অনায়াস ব্যবহার তাঁর বাক্যে পরিলক্ষিত হয়–

> "গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই– 'প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময় সিয়াখালার সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানা প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয় , উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম বাবা, 'মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজি কথা, মাইল শব্দের অর্থ ক্রোশ, ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর;"[১০]

বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য সাহিত্যের লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে খ্রিষ্টান মিশনের উদ্বোধন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা বাংলা গদ্যের গঠনশৈলী রূপায়নে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। মূল উদ্দেশ্য ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশীয় রীতিনীতি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে অবগত হওয়া। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ব্যবস্থাপনার ভার বাহক ছিলেন উইলিয়াম কেরি। কেরি বাংলা ভাষা শিক্ষনের জন্য এদেশীয় দুই পন্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করেন। তাদের একজন রামরাম বসু অন্যজন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। কলেজে যোগ দেওয়ার পর রামরাম বসু দুটি গদ্য পুস্তক রচনা করেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ব্যবহারের জন্য মৃত্যুঞ্জয় চারটি বইয়ের সংকলন করেন– 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) 'রাজাবলি' (১৮০৮) 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' (১৮১৩)। অপরদিকে উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের ছাপাখানা থেকে সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও মাসিক 'দিকদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করে এই ছাপাখানা। ছাপাখানা থেকে কেরি দুইখানি বই প্রকাশ করে 'কথোপকথন'(১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। গদ্য চর্চার পথ সুগম করতে কেরি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। কেরির গদ্য আধুনিক বাংলা গদ্য নির্মাণের প্রথম মাইলষ্টোন। কেরির গদ্য রচনার কিছু অংশ এখানে উল্লেখিত–

> "হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখানে আপনি কাঁচা বাচা নিয়ে লরিতে পারি না সকল কামিই বড় বউ করে ছোট বড় হিজল অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝকড়া। কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগি বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এ সংসারের কাজকাম করে আর ছেলেপিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমাদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্য আমার কোন ব্যামহ নাহি।"[১১]

কেরির সহকারী অধ্যক্ষ রামরাম বসু'র 'রাজা প্রতাপাদিত্য' প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ বলে মনে করা হয়। আলোচ্য গ্রন্থের কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা হল–

> "যে কালে দিল্লীর তক্তে হোমাঙু বাদশাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদশাহের তফাৎ হইলে হেন্দোস্থানে বাদশাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙু ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেক গুলিন সন্তান তাহাদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর ২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল।"[১২]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের লেখক গোষ্ঠীর গদ্যরীতিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় -

১. শব্দ নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা।

২. দূরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশ সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধবোধে অনিশ্চয়তা।

৩. সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য নিরূপণে সুমিতিহীনতা।

তবে একথা সত্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চা বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। বিচিত্র পথিকের যাতাযাতের পক্ষে সহায়ক হয়ে ওঠে। এই পথে রামমোহন রায় অগ্রসর হন। তিনি বাংলা গদ্যকে কলেজের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে ব্যাপক মধ্যবিত্ত সমাজের মাঝে নিয়ে আসেন। আবার গদ্যকে সর্বকার্যে নিয়োগ ও সর্বজনের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের প্রধান কীর্তি। সমালোচক তাই বলেন–

> "the development, a little letter, of the news paper and periodical journalism generally was another factor making for the utilitarian virtue in prose।"[১৩]

গদ্যের আড়ষ্টতা দূর করে আভিধানিক অচলতা থেকে বাংলা শব্দভান্ডারকে ব্যবহারের স্রোতের মধ্যে নামানো হয়। ফলত গদ্য সাহিত্যের নমনীয়তা বাড়ে শব্দসম্ভার বাড়ে। এই পর্যন্ত বাংলা গদ্যে সাহিত্যিক সুষমা ও ভারসাম্য ছিল না তা দেখা যায় বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতিতে। সংস্কৃতে দূরান্বয় বিস্তারধর্মী গদ্যের আধুনিক রূপকর্তা তিনি পল্লবীত সমাস পটলযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ ছেদ প্রয়োজনহীন ধ্বণিতরঙ্গিত গদ্য রচনা করেন নি। স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষ তৎসম শব্দাবলীর ধ্বনিরোলে তাঁর গদ্য পাঠককে মুগ্ধ করে। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। সেকালে তাঁর গদ্য প্রসঙ্গে এমনও শোনা যায় –

> "যে ইংরেজির পারগামীরা পর্যন্ত দুই এক ঘণ্টা আমাদিগকে স্বভাষায় উপদেশ দিতে লজ্জা বোধ করেন না। ইটি আপনারই কীর্তি...।"[১৪]

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে তখনকার বাঙালি সমাজ বাংলা গ্রন্থ অধ্যায়নে প্রবৃত্ত ছিলেন না। কারণ বাংলা গদ্য তার চলার প্রশস্ত পথটি রচনা করতে পারে নি। এই পথ রচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং। গদ্য লেখক হিসেবে বিদ্যাসাগরের মর্যাদা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পায় বাংলা বর্ণমালার সংস্কার সাধনে। বাংলা ভাষার দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ৯ এর ব্যবহারকে বিদ্যাসাগর বর্জন করেন। স্বরবর্ণের দুটি বর্ণ (ং) অনুস্বর ও (ঃ) বিসর্গকে বিদ্যাসাগর ব্যঞ্জনবর্ণে অবস্থিত করলেন এবং (ঁ) চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে মান্যতা দিলেন। বাংলা গদ্যের পথকে প্রশস্ত করতে প্রাথমিক স্তরে মিশনারী স্কুলের ছাত্রদের বাংলা শেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর রচিত শিশু শিক্ষা উপযোগী বর্ণপরিচয় ও বোধোদয় তখন মিশনারি স্কুলগুলিতে ছিল অবশ্যপাঠ্য। কারণ –

> "সোসাইটি প্রকাশিত শিশুশিক্ষার এই বইগুলি বিদ্যাসাগরের বইগুলির তুলনায় এত অপকৃষ্ট ছিল যে মিশনারিরাও বিদ্যাসাগরের বইয়ের বদলে এগুলি পড়ানোর কথা ভাবতেই পারলেন না।"[১৫]

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেও তাঁর সমকালে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি নিয়ে নানা ধরণের বিরূপ সমালোচনা ও মন্তব্যের সম্মুখাবিষ্ট হতে দেখা যায় তাঁকে-

> "শুধু লেখালেখি করেই ক্ষান্ত হলেন না মার্ডক। মিশনারিদের ধরে ধরে তিনি জানতে চাইলেন, কেন তাঁরা বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চারুপাঠ-এর মতো বই স্কুলে পড়ান। বেশিরভাগই বললেন উন্নত রচনারীতির জন্য। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক মিশনারী বললেন, 'চারুপাঠ'-এর সমমানের কোন বই আমাদের দিন- আমরা তাই পড়াবো। অন্যদল বললেন: আপনার তত্ত্বাবধানে 'খ্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি' শিশুপাঠ্য যে বইগুলি প্রকাশ করেছে, সেগুলি মোটেই সুবিধার নয়। এগুলি পড়ে ছেলেরা বাংলা শিখতে পারবে না।"[১৬]

তবে বিদ্যাসাগর রচিত গদ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সীতার বনবাস' গ্রন্থটিকে বিদ্যাসাগর রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে মনে করতেন তাঁর সমকালের পাঠকবৃন্দ। 'সীতার বনবাস'- এর ভাষা একাধারে সুধাবর্ষিণী হৃদয়গ্রাহীনিও বটে। গদ্যে করুণ রসের অবতারণায় বিদ্যাসাগরের অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় আমরা এখানে পায়-

> "সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিনী তীরবর্তী তপবন; গৃহস্থগন, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক, এই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সততা সঞ্চরমান জলধরমন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদ সমুহে আচ্ছন্ন, থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়।"[১৭]

সহজ সরল গদ্য রচনায় মধুর বাক্যালাপে তেজস্বিনী ভাব প্রকাশে সকল প্রকার রচনায় বিদ্যাসাগর সিদ্ধহস্ত। বাংলা গদ্যের শরীর নির্মাণে বিদ্যাসাগরের অবদান তাঁর সমকালে তো বটেই একালের সমালোচকেরা অস্বীকার করতে পারেন না তাই তাঁর গদ্যরীতির চর্চা সভা-সমিতি সাহিত্য আসরে ও পত্র-পত্রিকায় লক্ষ করা যায়-

> "গদ্য বিদ্যাসাগরের পূর্বে অনেকেই লিখেছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে শিল্প সুষমামন্ডিত করে তোলেন। কবিতার মত গদ্যের যে নিজস্ব ছন্দ আছে, বিদ্যাসাগরের পুর্বে আর কোনও বাঙালি গদ্যলেখক আবিষ্কার করতে পারেননি।"[১৮]

অন্যদিকে 'বাংলা গদ্যের অস্থির রূপটিকে স্থির করেছিলেন যিনি' এ কথা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় লেখকদের জানান –

> "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের অস্থির রূপটিকে স্থির করে দিয়ে গেছেন। তিনি রচনা করেছেন নানা রকমের বই। ...তাঁর সব রচনাই নানা দিক দিয়ে অমূল্য। বিদ্যাসাগরই সবার আগে আবিষ্কার করেন বাংলা গদ্যের ছন্দ। একথাটি আমাদের প্রথম দিকের গদ্য শিল্পীরা বুঝতে পারেননি। তাই তাঁদের গদ্য প্রাণহীন। গদ্য রচনার ভেতরে গোপনে লুকিয়ে থাকে ছন্দ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটি বুঝেছিলেন।"[১৯]

তথ্যসূত্র :

১. বিশি, প্রমথনাথ ও দত্ত বিজিতকুমার সম্পাদিত, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৪১৪, পৃ. ২৮

২. সেন ডক্টর সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪০১, পৃ. ২৯
৩. ঐ, পৃ. ৩৫
৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, প্রথম দে'জ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৭, পৃ. ৯৩
৫. ঐ
৬. ঐ, পৃ. ৯৫
৭. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম কামিনী সংস্করণ, শুভ মহালায়া, ১৩৯৯, পৃ. ১২১
৮. ঐ, পৃ. ৯১২-১৩
৯. ঐ, পৃ. ৩৪১-৪২
১০. ঐ, পৃ. ৩৩৭
১১. পূর্বোক্ত ১, পৃ. ১২৮
১২. ঐ, পৃ. ২০
১৩. Eighteen Century Prose, 1700-1800, P.X.V, D.W.Jefferson.
১৪. বসু, স্বপন, সমকালের বিদ্যাসাগর, পুস্তক বিপণি ,২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৫৯, পৃ. ১৩৪
১৫. ঐ, পৃ. ১২৪
১৬. ঐ, পৃ. ১২৮
১৭. পূর্বোক্ত ৭, পৃ. ২৪২
১৮. https://www.millioncontent.com
১৯. https://www.bongodorshon.com